অ ত নু চ ক্র ব র্তী

গীতিকবিতা থেকে কবিতাগীতি

'রেখো মা দাসেরে মনে এ মিনতি করি পদে
সাধিতে মনের সাধ ঘটে যদি পরমাদ
মধুহীন কোরো না গো তব মনঃ কোকনদে'

মাইকেল মধুসূদন দত্তর এই বিখ্যাত চতুদর্শপদী কাব্যটির মধ্যে গানের হাতছানি পেয়েছিলেন একজন আধুনিক সুররচয়িতা, যার পরিণতি, রচনার শতবর্ষ পেরিয়ে কবিতাটি গানের আদলে রেকর্ডে প্রকাশিত হয়েছিল। কবিতাটির মধ্যে গান গেয়ে ওঠার আকুলতা ছিল কিনা, সুরের ভার চাপানোর ফলে কবিতাটির মহিমা ক্ষুণ্ণ হল কিনা, অথবা গান হয়ে উঠল কিনা এ নিয়ে দ্বন্দ্ব থাকতে পারে, কিন্তু কবিতাকে সুরে সাজানোর এটি একটি ব্যতিক্রমী উদ্যোগ। এই ঘটনার পঞ্চাশ বছর পরে, কিছুদিন আগে জীবনানন্দর 'রূপসী বাংলা'র কবিতা আধুনিক বাংলা গানের সংকলনে ঢুকে পড়ল। এ দুইয়ের অন্তর্বর্তী পর্বে বিস্তর কবিতার ওপর সুরপ্রয়োগের নিরীক্ষা হয়েছে, অধিকাংশই গুরুত্বহীনতায় হারিয়ে গেছে, কিছু জনপ্রিয় হয়েছে, সময়কে পেরিয়েও মহিমা হারায়নি এমন কবিতাগীতিও সুলভ। মধুসূদনকে একটি ফলক হিসেবে ধরে নেবার কারণ, আর বেশি পিছিয়ে গেলে কবিতা আর গানের অন্তর্বর্তী বিভাজনরেখা ক্রমশ অস্পষ্ট হতে হতে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

আঠারোশো আশিতে লেখা বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' উপন্যাসের উজ্জীবনী হিসেবে সংযোজিত দেশমাতৃকার প্রশস্তিবাচক কবিতা 'বন্দে মাতরম'-ও গান হয়ে উঠেছে। সেক্ষেত্রে রচয়িতা স্বয়ং কবিতাটিকে 'মল্লার' রাগের আধারে সুর করেছিলেন, অর্থাৎ স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রই তাঁর রচনাটির মধ্যে গান হয়ে ওঠার সম্ভাবনা দেখেছিলেন। এই সম্ভাবনা পুনঃপ্রতিষ্ঠা পায় বঙ্গভঙ্গের সময়। বঙ্কিমের সুররচনার তথ্য পাওয়া গেলেও সুরটি পাওয়া যায় না। দেশমাতার বন্দনাগীতি হিসেবে বন্দে মাতরমের সম্ভাবনা উপলব্ধি করে রবীন্দ্রনাথ এটি সুর করেন 'দেশ' রাগে। সুররচনার সৌকর্যে বা রবীন্দ্রনাথের মহিমায় সেই সুরটিই প্রতিষ্ঠা পেয়েছে সর্বাধিক। এরপর উনিশশো

সাতচল্লিশে জগন্ময় মিত্র 'বন্দে মাতরম' অন্য সুরে রেকর্ড করেন, একান্ন সালে সিনেমার প্রয়োগের তাগিদে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সুরে 'বন্দে মাতরম' বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল। এ ছাড়াও ওঙ্কারনাথ ঠাকুর শাস্ত্রীয় সংগীতের আঙ্গিকে বন্দে মাতরম গেয়েছেন, তিমিরবরণও সুর করেছেন 'বন্দে মাতরম' এবং এমন উদ্যোগ পরবর্তীকালেও হয়েছে।

এই একটি কবিতাকে বারংবার সুরে ফেলে গানের চরিত্র দিতে চাওয়ার পেছনে তৎকালীন রাজনৈতিক পটভূমি, আনন্দমঠ উপন্যাস, 'বন্দে মাতরম' ধ্বনির মহিমা, দেশপ্রেমের উজ্জীবন এমন অনেক সূত্র রয়েছে, সেইসঙ্গে সুরের জোরে কথাগুলোকে আরও তীক্ষ্ণ করে তোলার জন্যই এমন উদ্যোগ এবং তা ফলপ্রসূ হয়েছে, প্রায় জাতীয় সংগীতের মর্যাদা পেয়েছে গানটি। কিন্তু একটি সুর প্রচলিত থাকা অবস্থায় একই গানের অন্য সুরারোপ কবিতার প্রতি আস্থার বিজ্ঞপ্তি হলেও সুরকারের প্রতি অনাস্থার প্রকাশ। এমন উদাহরণ গজল বা ভজনে সুলভ হলেও বাংলা গানে বেশি নেই। সেক্ষেত্রে ভজনে ভক্তি এবং আত্ম নিবেদনের ভাষা মুখ্য, সুর গৌণ। গজলে রচনাসৌকর্য এবং বক্তব্য মুখ্য, সুর গৌণ। সুর না থাকলেও গজলের মহিমা অক্ষুণ্ণ থাকে। সুরের ডানায় ভর করে কবিতার ওড়বার এই প্রবণতা তার জন্মসূত্রের সঙ্গে লগ্ন হয়ে আছে।

এক সময় যাহা গান তাহাই কবিতা ছিল, বাংলা ভাষাটাই গানের সঙ্গে জড়িয়ে ক্রমশ পরিণত হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, পদাবলি, মঙ্গলকাব্যর হাত ধরে উঠে আসা গানের শরীর থেকেই কালক্রমে নিজের স্বতন্ত্র আইডেনটিটি গড়ে নিয়েছে কবিতা, গানের পথ গেছে বেঁকে। কিন্তু দুইয়ের আত্মীয়তা ঘোচেনি। গানের শরীর গড়ে দিতে তৈরি হয়েছে গীতিকবিতা, কবিতার অন্তস্থলে রয়েছে সুরের সংকেত, দুইয়েরই ভিত্তিভূমিতে রয়ে গেছে ছন্দ। রবীন্দ্রনাথ যেমন বলেছিলেন, 'কবিতা অগীত সংগীত, গান গীত সংগীত'। অনেক ক্ষেত্রে গান গীতকবিতাও বটে।

যাত্রা-পাঁচালি-কবিগানের মাহোল থেকে রামনিধি গুপ্ত কাব্যগীতির যে সুষম কাঠামো নির্মাণ করেছিলেন তা আবার খেউড়ের অভিমুখে আত্মঘাতী হয়েছিল, কিন্তু নিধুবাবুর টপ্পা-রামপ্রসাদী-কীর্তন-নাট্যগীতি-ধ্রুপদি গান থেকে প্রেরণা নিয়ে ব্রহ্মসংগীতের আদর্শ আত্মস্থ করে রবীন্দ্রনাথ কাব্যগীতিকে প্রতিষ্ঠা দিলেন, উৎকর্ষের শিখরে। এক আশ্চর্য সমাপতন, যার হাতে কাব্য পেল নান্দনিক সুষমা, তিনিই হলেন কাব্যগীতির ভগীরথ। তিনি নিজেই কাব্যগীতির সুরস্রষ্টা, ফলে বাণী পেল প্রার্থিত সুরের ডানা, হয়ে উঠল অনিন্দ্যসুন্দর গান। গান রচনায় তিনি গড়ে নিলেন নিজস্ব রীতি। স্থায়ী-অন্তরার সঙ্গে যোগ হল সঞ্চারীর সৌন্দর্য। কথায়-সুরে-লয়ে কাঙ্ক্ষিত সামঞ্জস্য নিয়ে গান হয়ে উঠল নিটোল সৃষ্টি। রবীন্দ্রগানের লিরিকের সমৃদ্ধ কাব্যমূল্য তাকে কবিতার পঙ্‌ক্তিতেও তুলে এনেছে। রবীন্দ্রনাথ রচিত বহু কবিতাই গীতিরূপ পেয়ে গানের মর্যাদায় অভিষিক্ত এবং এই রূপান্তর স্বয়ং কবিরই কীর্তি। 'গীতালি',

'গীতিমাল্য', 'গীতাঞ্জলি'র কবিতা গান হবার জন্য উন্মুখ ছিল কিন্তু কবিতা হিসেবে স্বীকৃত, রচনারীতি গানের আঙ্গিকের নয়, এমন বহু কবিতাকে গানের চরিত্র দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ এবং সেসব গান মাইলফলক হয়ে আছে।

'হে মোর চিত্ত পুণ্য তীর্থে' বা 'যেথায় থাকে সবার অধম দীনের হতে দিন' জন্ম লগ্ন থেকে কবিতা হিসেবেই মহিমান্বিত ছিল। একবার সাতই পৌষের অনুষ্ঠানে ওই কবিতা দুটিকে গাওয়াবার ইচ্ছে হল বলে রবীন্দ্রনাথ দুটি কবিতাই প্রভাতী রাগে সুর করে ফেললেন! ওই কবিতার লিরিকে সুর প্রয়োগের মতো স্থিতিস্থাপকতা ছিল, উপরন্তু কবিতার স্রষ্টা নিজেই সুরে সাজালেন—কবিতা হয়ে উঠল 'গান'। 'ওই মহামানব আসে' রচনাটি নিয়ে কবি নিজেই কবিতা এবং গানের অন্তর্বর্তী ঘোমটা খুলে দিয়েছেন, 'সৌম্য (সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর) মানবের জয়গান করে একটি কবিতা লিখতে বলেছিল, তাই এই কবিতা রচনা করে দিয়েছি। ওটাই হবে নববর্ষের গান; বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। 'কৃষ্ণকলি' কবিতাটি চল্লিশ পঙ্‌ক্তির তালবাদ্যে মেজাজ ক্ষুণ্ণ হতে পারে ভেবেই হয়তো মুক্তছন্দে আবৃত্তির ঢঙে কবিতাটিকে গানের রূপ দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এভাবেই কবিতা এবং গানকে তিনি মিলিয়ে দিয়েছেন বারবার।

কবিতা সুর করে পড়া কোনো নতুন ঘটনা নয়, প্রাচীন গ্রিসে, 'লায়ার' বা বীণা বাজিয়ে যে কবিতা পড়া হত তাকেই বলা হত 'লিরিক'। নিগ্রো কবিরা অনেকেই সুর করে কবিতা পড়তেন। বিদেশে ব্যালাড বা গাথাধর্মী কবিতা সুরে উপস্থাপনার রীতি ছিল। আজও হিন্দি বা উর্দুভাষী কবিরা মুশায়রা বা কবি সম্মেলনে সুর করে কবিতা পড়েন। যেসব ক্ষেত্রে কবিতার রচয়িতা স্বয়ং কবিতার মেজাজ অনুযায়ী সুর প্রয়োগ করে নিজেই উপস্থাপন করছেন বা গাইছেন, তা শ্রোতার ভালো লাগতে পারে বা মন্দ, কিন্তু প্রশ্ন তুলে লাভ নেই। অন্য কেউ সেই কাজটি করলে সার্থকতার প্রশ্ন ওঠে। কবি নিজেই যদি কুশলী সুরস্রষ্টা হন, দুটি ক্ষেত্রে একই চিন্তার স্রোত এসে পড়বার সম্ভাবনা বাড়ে। রবীন্দ্রনাথের পথে নজরুল ইসলাম নিজের অনেক কবিতায় সুর করেছেন। দ্বিজেন্দ্রলালও করেছেন। যা গান হিসেবে স্বীকৃত।

সংগীতচিন্তক রবীন্দ্রনাথ গান ও কবিতার সম্পর্ক বিষয়ে নিজস্ব উপলব্ধি নানাভাবে প্রকাশ করেছেন। 'সংগীত কবিতার ভাই' যেমন বলেছেন তেমনই বলেছেন, 'খুব ভালো কবিতাও গানের পক্ষে খারাপ হইতে পারে, খুব ভালো গানও হয়তো পড়িবার পক্ষে ভালো না হইতে পারে। সাধারণ কবিতা পড়িবার জন্য সংগীতের কবিতা শুনিবার জন্য।' রবীন্দ্রনাথের কবিতাগীতিতে সুরের প্রভাব অনেকক্ষেত্রেই কবিতায় অতিরিক্ত মাত্রা যোগ করেছে 'অগীত' সংগীত রূপান্তরিত হয়েছে 'গীত' সংগীতে।

তবে এমন নিরীক্ষার পথ ক্রমশ সংকুচিত হয়েছে। যেহেতু রবীন্দ্রানুসারী কবিদের মধ্যে বলিষ্ঠ সুররচয়িতার অভাব এবং অন্য কবিরা রবীন্দ্রপ্রভাব এড়িয়ে কবিতাকে স্বতন্ত্র স্টাইল দেবার উদ্দেশ্য নিয়ে এগিয়েছেন। তাদের উদ্যোগেই ক্রমশ পালটে

গেছে কবিতার আঙ্গিক, বিষয়ভাবনা, ছন্দপ্রকরণ, শব্দ নির্বাচন এবং ব্যবহারের চরিত্র। সচেতনভাবেই তারা গানের কবিতা থেকে দূরত্বে তাঁবু বসাতে চেয়েছেন। এমন দু-একটি কবিতার পঙ্‌ক্তি—

১. পেশীরূঢ় বাহু দিয়া ভেদি চলি পর্বতের পর
কৃষ্ণপর্বতের স্থূল অঙ্গে নাই সবুজের বাস

২. রডোডেনড্রন ছিল কার্ফুকবলিত সানুদেশে
শীতের এক নির্বান্ধব কুকুর কেঁদেছে সে সময়

৩. ঘোড়াগুলি উড়িতেছে এইখানে এশিয়ার উপরে
অথবা আমরাই উড়িয়াছি ঘোড়া

৪. মনে হয় ফুটো করে দিয়েছে আমাকে ছুঁচ
কিংবা ফালাকাটা আমার সর্বাঙ্গ একবিংশ শতাব্দীর মুখোমুখি

এইসব কবিতায় সুরসংযোজনায় আগ্রহী হননি কবিরা, কোনো দুঃসাহসী সুরকারও এগিয়ে আসেননি, ফলে কবিতা গান হয়ে ওঠার উদাহরণ ক্রমশ হ্রাস পেয়েছে। তবে সমকালীন সুরকারেরা অতীতের কবিতা নিয়ে এমন নিরীক্ষা মাঝেমধ্যে করেছেন। যতীন্দ্রমোহন বাগচির কবিতা 'বাঁশবাগানের মাথার ওপর চাঁদ উঠেছে ওই' সুর করেছিলেন সুধীন দাশগুপ্ত, সে গান প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠে যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়েছিল। সেই কবিতায় 'শ্লোক'কে 'শোলোক' করে রেখেছিলেন কবি, 'মাগো'—সম্বোধন ছিল, ফলে সুরকারকে ঝুঁকি নিতে হয়নি।

কবিতাকে গান করে তোলার উদ্যোগ হিসেবে সাম্প্রতিককালের উল্লেখযোগ্য ঘটনা সুকান্ত ভট্টাচার্য-র 'রানার'। সলিল চৌধুরীর সুরে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে সে গান প্রায় রূপকথা হয়ে গেছে। সলিল নিজের লেখা গানেও নমনীয়তায় আস্থা রাখেননি, অন্তত প্রথম পর্বে, ফলে এ ধরনের কাজে উৎসাহী ছিলেন। রানার সুর করবার পেছনে তাঁর রাজনৈতিক বিশ্বাস এবং কার্যাবলিরও ভূমিকা রয়েছে। তবে এই সাফল্যে উদ্‌বুদ্ধ সলিল চৌধুরী এরপরেই সুর করেন সত্যেন্দ্রনাথ দত্তর পালকির গান। সে-গানে কবিতার চিত্রকল্প তুলে আনতে 'হুমনা', 'হুমনা', শব্দ যোগ করে, পৌনঃপুনিক ব্যবহারে উদ্যোগী হয়েছিলেন সলিল। এরপর কবিতার সুরসংযোজনা যেন সলিল চৌধুরীর একটি দায় হয়ে ওঠে। তিনি সুকান্তর 'ঠিকানা' 'অবাক পৃথিবী' মধুসূদন দত্তর 'আশার ছলনে ভুলি', 'রেখো মা দাসেরে মনে' থেকে অন্নদাশঙ্কর রায়ের ছড়া 'তেলের শিশি ভাঙলো বলে' অনেক কবিতাই গানের রূপ দিয়েছেন। ছড়ায় সুর করে গাওয়ার চল হয়েছিল 'অ-য় অজগর আসছে তেড়ে', 'হাট্টিমা টিম টিম', 'জপমালা ঘোষের কণ্ঠে রীতিমতো জনপ্রিয় হয়েছিল। সুকুমার রায়ের 'ননসেন্স

ভার্স', 'বাবুরাম সাপুড়ে', 'গ্রীষ্মকালে গান ধরেছেন ভীষ্মলোচন শর্মা' সুরে গাওয়া হয়েছে, দাদাঠাকুরের লেখা 'কোলকাতা কেবল ভুলে ভরা', বা 'ভোটের গান'-এসব লেখা বেশ মজাদার গান হয়ে উঠেছিল।

মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের 'ঘুম আয় রে আয়', প্রেমেন্দ্র মিত্র 'সাগর থেকে ফেরা' গান হয়েছে। কিন্তু এমন উদাহরণ ক্রমশ কমে এসেছে। সলিল চৌধুরী বলতেন, 'কবিতাটা বারবার পড়তে পড়তে কবিতা থেকেই একটা সুরের আভাস উঠে আসে, সেটা নিয়েই কাজ শুরু করি'। অর্থাৎ কবিতায় ডুব দিয়ে সুর তুলে আনার উদ্যোগ, এই প্রক্রিয়া খানিকটা ফলপ্রসূ নিশ্চয়ই, তবে সুররচয়িতার কাব্যবোধ পরিণত হলে তবেই তিনি হতে পারেন এমন ডুবুরি। কিন্তু যে-কোনো কবিতায় সুরের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া যায় না, তাতে গানও হয় না, কবিতাটাও, বিধ্বস্ত হয়। রানার বা পালকির পরে কবিতায় সুর দিয়ে গান করাটা কারো কারো কাছে হয়ে উঠল মর্যাদার বা ব্যতিক্রমী। সুকান্তর রানার জনপ্রিয় হয়েছে বলে সুকান্তর 'একটি মোরগের কাহিনি' কবিতাটির ওপর সুর চড়ানো হয়েছিল। তা জনপ্রিয় হয়নি। শিল্পকর্মও নয়! জনপ্রিয়তার প্রতি স্বাভাবিক আসক্তি এবং তার ওপর ভর দিয়ে উতরে যাবার প্রবণতা থেকে অনেক কবিতাকে গানের অলিন্দে টেনে আনা হয়েছে। তেমনই একটি উদাহরণ জীবনানন্দ দাশের বহু আলোচিত কবিতা 'বনলতা সেন'। এটির জনপ্রিয়তার কথা ভেবেই হয়তো গানে রূপান্তরের ভাবনা। সুরকারকে 'শ্রাবস্তীর কারুকার্য' সুরের ধাঁচে আনতে হয়েছে, 'শিশিরের শব্দের মতো সন্ধ্যা নামার' বা 'পাখির নীড়ের মতো চোখের' বির্মূততা সুরে বাঁধবার ঝুঁকি নিতে হয়েছে এবং অনিবার্যভাবেই তিনি ব্যর্থ হয়েছেন। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এবং শক্তি চট্টোপাধ্যায়কে একসঙ্গে একটি আবৃত্তির রেকর্ডিংয়ে পেয়ে এই গানটির প্রসঙ্গ তোলা হলে দুজনের কেউই বিরক্তি গোপন করেননি, সুনীল গাঙ্গুলি বলেছিলেন 'ডিজাস্টার' শক্তি স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে বলেছিলেন 'কবিতার ওপর হামলা করার অপরাধে এদের তো শাস্তি পাওয়া উচিত।' জীবনানন্দর 'চিল' কবিতাটিকেও ওই রেকর্ডেই গান বানানোর চেষ্টা হয়েছিল। সে রেকর্ড অচিরেই হারিয়ে গেছে। প্রায় তিরিশ বছর পেরিয়েও সাম্প্রতিক সুরকার জীবনানন্দর আর-একটি অতিপরিচিত কবিতার ওপর সুর নিয়ে হানা দিয়েছেন এবং এবার বাণিজ্যিকভাবে গানটি সফলও হয়েছে কিন্তু কবিতাটির সুর করা হয়েছে দেউড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে, কবিতাটির ঘরে প্রবেশের পথে খোঁজেননি সুরকার। 'আবার আসিব ফিরে' কবিতাটি নাচের ছন্দে বেঁধেছেন তিনি এবং এই গান বাজিয়ে স্টেজে শিশুদের নাচ দেখা গেছে বহুবার। 'শঙ্খচিল' বা 'হাঁস হয়ে' 'কলমির গন্ধ ভরা জলে ভেসে' যাবার স্মৃতিমেদুরতা মিস্টিক অনুভব ছুঁতে যে কাব্যবোধ জরুরি তা সুররচয়িতায় ছিল তেমন প্রমাণ অন্তত সুরে মেলে না। এ দুইয়ের অন্তর্বর্তী পর্যায়ে কবিতায় সুর চাপিয়ে পরিবেশনার ছোটোখাটো জোয়ার বয়ে গেছে, যার রেশ আজও বহমান।

গত শতকের সত্তরের দশক থেকে কবিতা এবং গানের এরিনায় দুটি পালা

বদলের সংকেত এসেছে। প্রথমত, কবিতা আবৃত্তির প্রসার ঘটেছে। জনপ্রিয়, বাচিক শিল্পীদের আবৃত্তিকে শিল্পমাধ্যম হিসেবে প্রতিষ্ঠা দেবার উদ্যোগে গুরুত্ব পেয়েছে। যদিও অনেক কবিই তাদের কবিতা অতিরিক্ত আবেগ দিয়ে সুর টেনে টেনে পাঠে বড়ো একটা আগ্রহী হননি, কবিতার একান্ত পাঠই তাদের প্রথম পছন্দ, এ ছাড়া কবি নিজেদের কবিতা পাঠ করলে কবিতাটির প্রতি অন্তত বিশ্বস্ততার অনটন ঘটে না বলেই তাদের ধারণা, তবে কুশলী বাচিক শিল্পীদের আবৃত্তি কবিতার প্রচার স্বার্থে অনেকেই মেনে নিয়েছেন। আবৃত্তির আসরে কবিতাবাসরে ক্যাসেটে কবিতা পাঠের জনপ্রিয়তার সূত্র ধরে কবিতার সুরারোপের সংখ্যাও বেড়েছে। যে-কোনো জনপ্রিয় কবিতাই সুরের ছোঁয়ায় গান হয়ে উঠবে এমন বিশ্বাসে অনেকেই কবিতার গীতিরূপ পরিবেশন করতে থাকেন।

অন্যদিকে সুরের বৈচিত্র্যে মুগ্ধতা দেবার প্রক্রিয়ায় বাংলা গানের লিরিকে কাব্যমূল্যের প্রতি ঔদাসীন্য বেড়েছে। গীতরচনার দুর্বলতা, একঘেয়েমি এবং একই ঘেরাটোপে ঘুরে বেড়ানোর ফলে বাংলা গানের শ্রোতাদেরও আগ্রহ কমেছে। কবি এবং কাব্যবোধসম্পন্ন গীতরচয়িতাদের সূত্রে বাংলা গানের লিরিক যে উচ্চতায় পৌঁছেছিল তা ক্রমশ হ্রাস পেয়েছে। রবীন্দ্রপরবর্তী গীতরচয়িতাদের মধ্যে অজয় ভট্টাচার্য, শৈলেন রায়, প্রণব রায়ের মতো অনেকেই ছিলেন কাব্যবোধসম্পন্ন, পাশাপাশি প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিমলচন্দ্র ঘোষের মতো কয়েকজন কবিও গীতরচনায় মেধা বিনিয়োগ করেছেন, ফলে গানের লিরিকে কবিতার ছায়া পড়েছে। কিন্তু ক্রমশ তার মহিমা হারিয়েছে অতীতের দুর্বল অনুকৃতি এবং ক্লিশে হয়ে যাওয়া ভাবনা এবং শব্দব্যবহারে। এক সময় গীতরচয়িতা নিজেই গানে সুরসংযোজনার দায়িত্ব পালন করেছেন, তখন গানে যে সংহতি ছিল গীতিকার-সুরকার বিভাজনের ফলে সেই নান্দনিক ভারসাম্য সেভাবে রইল না। এই বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন সুরের আধিপত্যে সুরই গানের প্রভু হয়ে উঠলে গানের অবনতি হয়। ফলে কবিতায় যে উন্নতি ঘটেছে, গানে তা হয়নি। সময়ের পালাবদল, সামাজিক বিবর্তন শিল্পকলাকে প্রভাবিত করে, এই প্রভাবের সূত্র ধরেই নানা নিরীক্ষা, এটি কবিতা, চিত্রকলায় যেভাবে ঘটেছে, গানের ক্ষেত্রে তা হয়নি। লিরিকের অনটন শিল্পীর মহিমা, সুরের বৈচিত্র্য, বাদ্যযন্ত্রের সমাহারে আড়াল করার চেষ্টা হয়েছে। এভাবেই গানের লিরিক আশির দশকে এসে রক্তশূন্যতায় ভুগেছে। এই দোলাচলের মধ্যেই কবিতার সুরারোপ করে, লিরিকের মহিমা বাড়ানোর উদ্যোগ হয়েছে। সুভাষ মুখোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় থেকে জয় গোস্বামীর মতো কবিদের কবিতা সুরের চাদর জড়িয়ে তুলে আনা হয়েছে।

তবে কবিতাকে সুর দিয়ে গান করবার ব্যাপারে সমকালীন মেজর কবিদের মধ্যে তেমন উৎসাহ দেখা যায়নি। সুভাষ মুখোপাধ্যায় বলেছিলেন, 'কবিতা, গান দুটো আলাদা জিনিস। কবিতায় সুর যোগ করে, কবিতাটাও বাঁচবে, গান হিসেবেও সেটা

সার্থক হবে—দুরূহ ব্যাপার। আমার এতে আগ্রহ নেই, আপত্তিও নেই, আমার কবিতা অনেকে সুর করেছে কিন্তু উৎসাহিত হবার মতো কোনো উদাহরণ দিতে পারব না।'

'অমলকান্তি রোদ্দুর হতে চেয়েছিল' কবিতাটি গান হয়েছে শুনে অবাক নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী এ প্রসঙ্গে বলেছিলেন, 'কবিতা নিজের পায়েই দাঁড়িয়ে থাকে, তার আবৃত্তিকার, সুরকার বা গায়কের কোনো প্রয়োজন পড়ে না।'

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এবং শক্তি চট্টোপাধ্যায় দুজনেই কবিতা সুর করে গাইবার পক্ষপাতী নন, তাঁরা কেন গান লেখেন না এ প্রশ্নের উত্তরে সুনীল বলেছিলেন, 'মানসিকতা নেই', শক্তি বলেছেন 'গান লিখতেই পারি, কিন্তু কে সুর করবে?' কবিতার সুরসংযোজকদের প্রতি তিনি অনাস্থা প্রকাশ করেছিলেন। এটি একটি সমস্যা বটে, গীতিকার এবং সুরকারের মধ্যে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ আছে, কিন্তু কবির সঙ্গে সুরকারের সে সুযোগ কম। সুভাষ মুখোপাধ্যায় বলেছিলেন, 'আমার লেখা ফুলগুলো সরিয়ে নাও' কবিতাটি সুর করবে বলে একজন এসে বলল, এই শব্দটা এখানে না দিয়ে ওখানে, এভাবে না বলে ওভাবে করে দিন, না হলে ম্যানেজ করতে পারছি না। আমি বলেছিলাম, পালটানোর মতো হলে তো লেখবার সময়ই পালটে অন্যরকম লিখতাম।' তাঁর কবিতা অনেক শব্দ উলটে-পালটে যেমন গান হয়েছে, তেমন অনেক কবিতার গানেই ছন্দ ঠিক থাকেনি, অনাবশ্যক যতি বা সুর টেনে তার মাপে নিয়ে আসা হয়েছে বাক্যবন্ধ, ভেঙে দেবার ফলে শব্দ হারিয়েছে তার ঝংকার, দেখে-শুনে কবিরা গীতিরূপের প্রতি বীতশ্রদ্ধ।

অধিকাংশ সাম্প্রতিক কবিতা গীতিকবিতার সঙ্গে দূরত্ব বাড়িয়ে, স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে স্থিত। পেলবতার বদলে শব্দে উঁকি দেয় পাথুরে দৃঢ়তা, আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে নিজেকে আইডেন্টিটি দিয়ে ভাবনা-প্রয়োগ-শৈলী সবক্ষেত্রেই আধুনিক দিশা খুঁজে চলেছে।

'মোষের ঘাড়ের মতো পরিশ্রমী মানুষের পাশে
শিউলি ফুলের মতো বালিকার হাসি।'

বা ' সম্পূর্ণ আকাশটাকে ঘিরে ফেলেছে
হাজার শকুন
যেখানে ঝরেছে ফুল
ঝাঁপিয়ে পড়ছে তারা।'

বা 'কালো রাত কাটে না কাটে না
এত ডাকি রোদ্দুর এই পথে হাঁটে না
ঘরে না, মাঠে না।'

কিংবা, 'কী লাভ স্বপ্নের মধ্যে রক্তহীন
প্রাসাদ বানিয়ে
রক্ত যে অমোঘ—আমি জানি'

বা 'আমি রামায়ণ পড়িনি এবং আমি মহাভারত পড়িনি
কারণ অতি সোজা কোনো বই যদি যুদ্ধবিষয়ক
হয় তবে আমি সে বই পড়ি না।'

কিংবা 'এখানো নামেনি বন্ধু, নিউক্লিয়ার শীতের গোধূলি'
অন্তর্গত রক্তের ভিতরে খেলে যাওয়া এইসব 'বিপন্ন বিস্ময়' কি সুরের
প্রত্যাশী?'

এমন আধুনিক কবিতাকে গানে রূপান্তরে আগ্রহী দুঃসাহসী সুরকারের খোঁজ সহজে মিলবে না। সব কবিতাই এমন নয়, গীতিকবিতার ছায়া মাখা কবিতার ভাষা, ছন্দ, গঠন যদি সুরের হাতছানি দেয়, তাকে গানে রূপ দেবার উদ্যোগ হতে পারে। কিন্তু মনে রাখা দরকার সুরের সংগত অনেক কবিতারই স্বাভাবিক পৌরুষের পক্ষে হানিকর হতে পারে, সুরের অলংকরণ কবিতায় বাহুল্য হবার সম্ভাবনা থাকে, সুরের বিস্তারের জন্য প্রয়োজনীয় যতি অনেকক্ষেত্রেই কবিতার দৃঢ়-আটোসাঁটো বাঁধুনিকে শিথিল করে দিতে পারে। আধুনিক কবিতায় ব্যবহৃত অনেক শব্দই সুরধারণের মতো স্থিতিস্থাপক নয়। কবিতার আঙ্গিক বা গঠন প্রথাগত গানের মাপে আনা শক্ত। কবিতার পঙ্‌ক্তি ফিরে পড়বার প্ররোচনা দিতে পারে, কবিতার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য বোধের ক্ষেত্রে যে প্রতিক্রিয়া ঘটায় সেখানে সুর বা বাদ্যযন্ত্র বাধা হয়ে উঠতে পারে। সুরের সম্মোহনী বা নার্কোটিক এফেক্ট কবিতা টানটান অ্যাপ্রোচ বা ঋজুতার সঙ্গে একাত্ম হবার ক্ষেত্রে অন্তরায় হতে পারে। অতএব ঝুঁকি অনেক। শব্দ-বাক্যবন্ধ চেপে বসবে সুরের ঘাড়ে গানকে বাক্যের দাসত্ব করতে হবে। যাকে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন 'গানের উপদ্রব'।

'এক মুখ দাড়িগোঁফ অনেক কালের কালো ছোপ ছোপ জটা-পড় চুলে তার উকুনের পরিপাটি সংসার পিচুটি চোখের কোণে দৃষ্টি বিস্মরণে মগ্ন...' এমন একটি লিরিকে সুর সংযোজনায় উৎসাহী হবার মতো সাহসী সুরকার মেলা শক্তি কিন্তু রচয়িতা সুমন স্বয়ং একে গানের রূপ দিয়েছেন এবং গুরুত্বপূর্ণ কাজ হিসেবে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন।

কবিতাকে জোর করে গানের ঘরে টেনে আনবার বদলে গানের লিরিকে কাব্যবোধের পরিচয় রাখতে পারলে বরং গানের সমৃদ্ধি হতে পারে। সাম্প্রতিক অনেক গানে কবিতার শব্দময়তা আঙ্গিক বা মেজাজ উঁকি দিচ্ছে এটাই সুখের কথা। যা থেকে গানের সঙ্গে কবিতার আত্মীয়তার কথা মনে পড়ে যায়—

আমার দু-বাহু প্রসারিত করে / সূর্যের কোনো অঞ্চলে
পাক খেয়ে নেচে / অবশেষে এই / শ্বেতাঙ্গ দিন শেষ হলে
শান্তি শীতল / সন্ধে তন্বী / গাছের ছায়াই ভালো
রাত্রি নামবে তখন / আহা / আমার মতো কালো।'

অথবা

‘এখনও জীবনের / কোথাও না কোথাও
বিরল ভরসার / সাহসী সুরভি
এখনও রোদ্দুর / সহসা জ্বেলে দেয়
বিদ্রোহের রঙে / রক্তকরবী’

‘এত শব্দ এত চিৎকার, তবু কী নিদারুণ দৈন্য
তুমি কোথায় থাকো অনন্য’

‘পলাশের বাড়ি দত্তপুকুর / আমিনুল থাকে বেকবাগান
দুজনেরই দেশ বিংশশতক / একুশ শতক দিচ্ছে টান

এভাবেই একুশ শতকের দোরগোড়ায় এসে ‘গানের কবিতা’ নতুন বার্তা দিয়েছে।